নারী ঃ অনঙ্গ-বৌ ঃ

গঙ্গাচরণের স্ত্রী অনঙ্গ-বৌ তার বহুমুখী গুণের উদ্ভাসনে এই উপন্যাসে শুধু নারীদের মধ্যেই নয়, নারী পুরুষ সকলের মধ্যেই একটি শ্রেষ্ঠ চরিত্র। বিভূতিভূষণ সাধারণত শুধুমাত্র সৎগুণের দ্বারা কোন আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করেন না। দোষে-গুণে মিলিয়েই তিনি মানুষকে দেখেন। কারণ বাস্তব মানবচরিত্রে ভালো-মন্দ দুই-ই কমবেশি বিদ্যমান থাকে। কিন্তু অনঙ্গর মধ্যে লেখক যেন কেবলমাত্র সৎগুণেরই সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

অনঙ্গকে দিয়েই উপন্যাসের শুরু এবং শেষেও সে আছে। কিন্তু যেহেতু এই উপন্যাসের নায়ক বা নিয়ন্তা মহাকাল, তাই অনঙ্গকে এর নিয়ন্ত্রী-নায়িকা বলা যাবে না। অর্থাৎ যে শক্তি উপন্যাসের গতি-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে শক্তি তার হাতে নেই। কিন্তু লেখক যেন প্রজ্ঞা-পারমিতা স্বরূপা প্রৌঢ়াকে দিয়ে অনঙ্গ-রূপিণী অঙ্গনাদের সাবধান করে দিয়েছেন—'কুমীর এয়েচে নদীতে।' এই ব্যঞ্জনাবহ অশনি-সংকেতের বাণী অনঙ্গ অবশ্য ভুলে গেছে তার দৈনন্দিন কাজের মাঝে। কিন্তু মহাকাল নীরব কর্মী।

হরিহরপুর থেকে ভাতছালা, ভাতছালা থেকে বাসুদেবপুর এবং তারপর এই চরপোলতার নতুন গাঁ। স্বামী গঙ্গাচরণের সঙ্গে ভাগ্যান্বেষণে তার অক্লান্ত দেশভ্রমণ। কোথায় একটি মনের মত নীড় রচনা করা যায়—এই তার একান্ত ইচ্ছা। ভাতছালার পদ্মবিলের ধারে একখানা ঘর বাঁধবার বড্ড সাধ তার। সেই সাধেই সে নতুন গাঁয়ের খড়ো ঘরের চালে কুমড়োর লতা তোলে কঞ্চি দিয়ে। উঠোনের ধারে লাগায় পেঁপে মানকচুর গাছ। দুটি সন্তান নিয়ে তার স্নেহের সংসার। 'পণ্ডিত' স্বামীর গৌরবে সে গরবিনী স্ত্রী। কিন্তু তাই বলে তার অহঙ্কার নেই। সুখের দিনে সে অসময়ের বন্ধুদের ভুলে

যায়নি। শুধু মানুষের প্রতি মমতা নয়, মাটির মমতা তাকে টেনে নিয়ে যায় ভাতছালার পুরনো ভিটের কোলে। সেখানে একে একে এসে জড়ো হয় মতি-বাগদিনী, মতি-মুচিনী, কালী গোয়ালিনীরা। এরা একদিন তাকে সাহায্য করেছিল, তার উপকারে লেগেছিল। প্রতিবেশিনী তথা মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতাবোধ তার চরিত্রের অলংকার। এদের মধ্যে কয়েকদিন কাটিয়ে সে আবার ফিরে যায় নিজের গৃহে। স্বামী বুদ্ধিমন্তা আর পরিশ্রম দিয়ে যা সংগ্রহ করে আনে তাকে সে গুছিয়ে তোলে। শ্রান্ত ক্লান্ত স্বামীকে সে সেবা দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে ক্ষুধার খাদ্য দিয়ে সুস্থ ও সুখী করার চেষ্টা করে। তার গৃহিণীপনার প্রশংসা না করে কেউ পারে না।

গৃহজীবন সুখের হয় দেবতার আশীর্বাদে। শাস্ত্রে বলেছে অতিথিসেবা মানেই দেবসেবা। অনঙ্গর অতিথিসেবা কিংবদন্তি-তুল্য। সে দীনু ভট্চায এবং দুর্গা বাঁড়ুয্যের যেভাবে সেবা করলো তার তুলনা নেই। দীনু ভট্চায আউশ চালের রাঙা ভাত, ঢেঁড়শভাজা, ডাঁটা-চচ্চড়ি—যা খায় তাই বলে—'মা লক্ষ্মীর রান্না যেন অমর্তো।' আর দুর্গা পণ্ডিত বলে—'যদি কখনো না খেয়ে বিপদে পড়ি, তুমি একটু ঠাঁই দিও অন্নপূর্ণা। বড্ড গরিব আমি।' একথা করুণা-রূপিণী জননী ছাড়া কাকেই বা বলা যায়!

মন্বন্তর চারিদিকে করাল মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে। অভাবের সংসারে স্বামী অতিথিসেবায় আপত্তি জানালে অনঙ্গ জিভ কেটে বলেছে—'ছিঃ ছিঃ—অতিথি নারায়ণ, আমার বাড়ি উনি এয়েচেন, আমাদের কত ভাগ্যি!' নিজের হাতের পেটি বন্ধক দিয়ে সে দীনু ভট্চাযের জন্য চালের জোগাড় করে দিতে বলেছে গঙ্গাচরণকে ; না হলে বারবার বলেছে, সে মাথা খুঁড়ে মরবে। নিজের মুখের গ্রাস সে অতিথিকে দিয়ে অনেকদিন অনাহারে থেকেছে। তার ঈশ্বর-নির্ভরতাও উল্লেখযোগ্য। সে বলেছে, অতিথিকে যিনি পাঠিয়েছেন, তিনিই তার আহারের ব্যবস্থা করে দেবেন। সে সংসারের কল্যাণী এবং ধারিণী শক্তি। নিজের প্রাণপাত পরিশ্রম দিয়ে সে তার স্বামীপুত্রদের মুখে আহার জোগাবার চেষ্টা করেছে। মতি-মুচিনী, কাপালীবৌদের সঙ্গে সে দুর্গম বনে মেটে আলু সংগ্রহ করতে গেছে ; ব্রাহ্মণের গৃহবধূ হয়েও অন্ত্যজ কাপালীদের বাড়িতে ধান ভানতে গেছে। স্বামীর কাছে সে গোপন করেছে, পরে সব খুলে বলেছে এবং স্বামী ক্ষুব্ধ হলে সোহাগ দিয়ে মিষ্টি কথায় সে স্বামীর মন ভোলাতে চেয়েছে।

দুর্ভিক্ষ মানুষকে প্রাণে মেরেছে, কিন্তু অনঙ্গর মত মানুষদের হৃদয়কে মারতে পারেনি। সে বেনাপোলের বোষ্টমের প্রভাতী গান শুনতে চায়—'উঠ গো নন্দরাণী কত নিদ্রা যাও গো'—তার বেশ লাগে। সে মাসে একটা করে টাকা দিয়ে প্রতিদিন এই গান শুনতে চায়। স্বামী অভাবের কথা বললে বলে—'আমি যেখান থেকে পারি জুটিয়ে দেবো, তুমি ভেবো না কিছু। গরিব বলে কি ভাল গান শুনতে নেই?' এই আনন্দবোধ ও রসবোধই তাঁকে দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট হতে দেয়নি; নবীন প্রাণে উজ্জীবিত করেছে। প্রকৃতির লীলায় সে নবজাতকের জননী হয়েছে। মন্বন্তরে মৃত্যুর লীলা চলেছে, কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রবাহ ব্যাহত হয়নি।

এই বিস্ময়কর রসবোধ ও আনন্দবোধের সঙ্গে অনঙ্গর ছিল মধুর এবং অলঙ্ঘনীয় ব্যক্তিত্ব। এরই জোরে সে ভাঙনের মুখেও সংসারটিকে বহুদিন ধরে রাখতে পেরেছে। তার স্নেহচ্ছায়ায় দুর্গা বাঁড়ুয্যে সপরিবারে আশ্রয় পেয়েছে। আবার কাপালী-বৌ তার দুষ্কর্মের কথা সব খুলে বলেছে ; তার অসৎপথে অর্জিত চাল থেকে কিছু অনঙ্গকে সে

ভাগ দিতে চেয়েছে। অনঙ্গ তাকে মৃদু তিরস্কার করেছে কিন্তু নির্মম হয়নি। মহাপুরুষরা যে বলেছেন—পাপকে ঘৃণা কোরো—পাপীকে নয়। অনঙ্গ যেন এই আপ্তবাক্য না জেনেই নিজের জীবনে পালন করেছে। তার সস্নেহ শাসনেই শেষপর্যন্ত কাপালী-বৌ পাপের অতলে তলিয়ে যেতে যেতেও ফিরে এসেছে। তার এই সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের উৎস তার অকৃত্রিম মানবতাবোধ বা মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা।

অনঙ্গ-চরিত্রের এই মানবতা-বোধের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে মতি-মুচিনীর মৃত্যু ও তার অন্ত্যেষ্টিকে কেন্দ্র করে। মতির মৃত্যুর খবর শুনে অনঙ্গ হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। তার সব থেকে বেশি কষ্ট হল যখন নীচু জাত বলে মতির মৃতদেহটা কেউ সৎকার করতে এগিয়ে এলো না—ছুঁলো না পর্যন্ত। বিভূতিভূষণ বলেছেন—'হৃদয় সকলের থাকে না, যার থাকে তার আনন্দও যত, কষ্টও তত।' অনঙ্গর তীব্র কষ্ট হল মতির দেহটা অবহেলায় পড়ে থাকতে দেখে—হতভাগী যে তাকে বড্ড ভালোবাসতো! সে যদি অক্ষম না হত, তাহলে ময়নাকে নিয়ে সে নিজেই মতির সৎকার করে আসতো!

তার এই আকুতি দেখেই দুর্গা বাঁড়ুয্যে এবং গঙ্গাচরণ এগিয়ে এলো মতির সৎকার করতে। এতদিন জাত্যাভিমানের যে-খোলসটা উচ্চবর্ণের মানুষকে ব্রাহ্মণেতর মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল তা অনঙ্গর দ্বারাই দূরীভূত হল। যে প্রজ্ঞাদৃষ্টি এতগুলি পুরুষের ছিল না, একটি সাধারণ অশিক্ষিতা গ্রাম্য নারী হয়ে কি করে সে তা লাভ করল ভাবলে অবাক হতে হয়। তাই আমাদের মনে হয় অনঙ্গ বিভূতিভূষণের কিছুটা real এবং অনেকখানি ideal দিয়ে গড়া। ডঃ বিনতা রায়চৌধুরী তাঁর 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন—'প্রথমদিকে সে সুগৃহিণীরূপে প্রশংসিত হলেও পরে তাকে অস্বাভাবিক মনে হয়।' এই অস্বাভাবিকতা ও অবাস্তব মনে হবার কারণ হল দুর্ভিক্ষের সময়ে তার অদ্ভুত মানসিক স্থৈর্য এবং অতিথিপরায়ণতা। ডঃ রায়চৌধুরী এও বলেছেন যে, অনঙ্গর মধ্যে দিয়ে বিভূতিভূষণ নারীর মঙ্গলময়ী কল্যাণী আদর্শকেই রূপায়িত করতে চেয়েছেন। আর সাহিত্যে—শিল্পের সঙ্গে আদর্শের বিরোধ আছে বলে মনে করি না। কারণ সাহিত্যিকও সমাজের শিক্ষক। যে কোন মহৎ শিক্ষার পেছনে মহৎ আদর্শের প্রেরণা থাকে। সমাজের যে অবক্ষয়িত অবস্থায় মনুষ্যসৃষ্ট মন্বন্তর সমূহ ধ্বংসসাধন শুরু করেছিল, সেখানে ভূয়োদর্শী লেখক উপলব্ধি করেছিলেন আদর্শের প্রয়োজন সর্বাধিক। অন্নহীন দেশে সামান্য খুদ-কুঁড়ো-সম্বল মানুষেরও কিছু করার আছে। হয়তো তার কাজ প্রয়োজনের তুলনায় যৎকিঞ্চিৎ, দিবাবসানে অন্ধকার বিশ্বে মাটির প্রদীপের আলোর মতই তা সামান্য, ক্ষুদ্র, তবু তা তুচ্ছ নয়। ক্ষুদ্রও মহৎকে প্রাণিত করে। রবীন্দ্রনাথের অনাথপিণ্ডদসুতা যেমন বলেছিল, 'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে তোমা সবাকার ঘরে ঘরে', সেও তো অনঙ্গর মতই পার্থিব সম্পদে নিঃস্ব রিক্ত সাধারণ নারী! কিন্তু আন্তর ঐশ্বর্যে তার মত ধনী আর ক'জন? তাই বিভূতিভূষণ ইচ্ছা করেই অনঙ্গকে আদর্শ করে সৃষ্টি করেছেন। এবং আদর্শের আতিশয্য কিছুটা থাকতেই পারে, তা দোষের নয়।

বিভূতিভূষণ অনঙ্গ চরিত্রের আর একটি দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন, সে হল তার ভবিষ্যৎচিন্তা! পেটের জ্বালায় ক্ষুধার্ত মানুষ তো সব খেয়ে ফেলেছে—বীজধান, বীজ—সব। তাহলে কৃষির ভবিষ্যৎ কী হবে? নতুন ফসল কি করে জন্মাবে? কি করে হবে নবান্নের উৎসব? অনঙ্গ যেন আদিম কৃষি-সভ্যতার আদি জননী! দুর্গা পণ্ডিতকে

সে একটা পুঁটুলি দেখিয়ে বলেছে—'জ্যাঠা- মশাই, বলুন তো এতে কি?... এতে আছে শসার বীজ, লাউয়ের বীজ আর শাঁকআলুর বীজ। কাপালীদের ছোট-বৌ দিয়ে গিয়েছে। এ পুঁতে দেবো আমাদের উঠোনে।' এ-প্রসঙ্গে Pearl. S. Buck-এর Refugee রচনাটির কথাই আমাদের মনে আসে। সেখানে বন্যাবিধ্বস্ত উদ্বাস্তু বৃদ্ধ চীনা কৃষকটি তার মাতাপিতৃহীন ছোট্ট নাতিটিকে এক বাটি নুড্‌ল্ কিনে দেবার পর যে অর্থ বাঁচলো, তা দিয়ে সে নিজের জন্য আর এক বাটি কিনল না; সেটা সে সঞ্চয় করে রাখলো বীজ কেনার জন্য। কারণ বীজ সবাই ক্ষিধের জ্বালায় খেয়ে ফেলেছে। সে নুড্‌ল্ বিক্রেতাকে বললো— '...if you had land you would know it must be put to seed again or there will be starvation yet another year. The best I can do for this grandson of mine is to buy a little seed for the land.. yea, even, though I die, and others must plant it, the land must be put to seed.' জমি থাকলেই তাতে বীজ বপন করতে হয়; তাতেই পেটের ভাত, নাহলে উপবাস। গঙ্গাচরণ তাই সারাজীবন জমির স্বপ্ন দেখেছে, আর অনঙ্গ করেছে বীজের সঞ্চয়।

কিন্তু অনঙ্গর স্বপ্ন তো পূরণ হয় না! সে যে পদ্মবিলের ধারে একটা মনের মত ঘর বাঁধতে চেয়েছিল... মন্বন্তরের ঝড়ো হাওয়ায় কোথায় হারিয়ে গেল তারা...! তাদের নিয়েই হয়তো কোন লোক-কবি গান রচনা করেন পরের প্রজন্মে—'কোন এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোন...' সেই চোখের জলের রূপকথা শেষ হয়েও হয় না কোনদিন! মানুষ শোনে...মহাকাল শোনে!... অনঙ্গ বিভূতিভূষণের অনবদ্য সৃষ্টি।